কাছের মানুষ – দূরের মানুষ

পণ্ডিত মিয়াভাই

পাঠক, আমরা আমাদের এই যাপিত জীবনে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়াও কত শত মানুষের সাথে একসঙ্গে চলি-ফিরি, মেলামেশা করি, কত জায়গায় যাই, কত কিছু দেখি, কত ঘটনার সাক্ষী হই। কালের বিবর্তনে সেসব মানুষ স্থান কাল বা ঘটনাসমুহ একদিন আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে যায়। আবার সেই স্মৃতিও একদিন কালের গহ্বরে স্মৃতির পাতা থেকে বিলীন হয়ে যায়। কোনো কোনো মানুষের কথা মাঝে সাজে মনে পড়ে, কারো কারো কথা আদৌ মনেই পড়ে না, আবার এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের কথা কোনো দিনই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। এরা হয়ত সমাজের কোনো নামী দামী ব্যক্তিত্ব নন, অতিসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনভাবেই এদের ভোলা যায় না। ঠিক তেমনি কিছু কিছু ঘটনাও আছে যা হয়ত অতি তুচ্ছ, কিন্তু মনের অতি গভীরে প্রথিত হয়ে বসে আছে, কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। এমনই কিছু মানুষ স্থান কাল পাত্রের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়াসে আমার এ "কাছের মানুষ - দুরের মানুষ" সিরিজের সূচনা। এ সিরিজের স্থান কাল পাত্র বেশীর ভাগই আমার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিতে ভরা। আপনাদের ভাল লাগার প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হোক আমার এই নূতন পথ চলা। সিরিজের প্রথম পর্বে যে মানুষটির কথা বলবো তিনি আমাদের পাশের বাসার এক উকিল খালুজানের ছেলে পণ্ডিত মিয়াভাই।

পণ্ডিত মিয়াভাই নামে পণ্ডিত হলেও লেখাপড়ায় ছিলেন ডু ডু; বাবা শিক্ষিত উকিল -তাই সখ করে ছেলেকে পণ্ডিত বলে ডাকতেন। আর সেই সুবাদে পাড়ায় সবার কাছে এমনকি গোটা মহকুমা শহরের সবার কাছে উনি আজীবন ঐ পণ্ডিত নামেই পরিচিত ছিলেন। উনার আসল নাম কি ছিল, তা আমি আজও জানিনা। জানার প্রয়োজন হয়নি কখনও, কেননা উনি পণ্ডিত ডাকেই সন্তুষ্ট ছিলেন। উনি ছিলেন আমাদের পাড়ার হর্তা কর্তা ধরনের মানুষ। পাড়ায় ছেলেরা ছেলেরা গণ্ডগোল করেছে, উনি তার বিচারক। দু'পক্ষকে এক জায়গায় ডেকে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে মিল মিশ করিয়ে বিচার করে দিতেন। কারো ছেলের বা মেয়ের হঠাৎ হাত পা কেটেছে বা ব্যথা পেয়েছে, বা কেউ গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙ্গেছে, পণ্ডিত মিয়াভাই সর্বাগ্রে দৌড়ে তাকে নিয়ে হসপিটালে। হয়ত ঐ আহত ছেলে বা মেয়ের বাবা মা তখনও জানে না তাঁর সন্তানের কি হয়েছে।

আমাদের পাড়াটা ছিল ঘর ঘর উকিল মোক্তারদের পাশাপাশি আবাসন। কারও পাকা কারও বা সেমি-পাকা বসত ঘর, প্রশস্ত উঠান, শান বাধন পুকুর, বাড়ির চারপাশে ফলফলাদির গাছ-গাছালিতে ঢাকা মফস্বল শহরের বাগান বাড়ি। আবার প্রায় সব উকিল মোক্তাদেরই শহরের বসত বাড়ীর পাশাপাশি

গ্রামে পৈত্রিক-সূত্রে প্রাপ্ত বা কেনা সূত্রে চাষাবাদের জমিজমাও ছিল। সেই জমি থেকে বছরের শেষে বর্গা চাষিরা ধান, পোলাওর চাল, মুড়ির চাল ও অন্যান্য ফসল দিয়ে যেতো। পণ্ডিত মিয়াভাই ছিলেন উকিল খালুজানদের সেই গ্রামের জমিজমার তদারকির দায়িত্বে। মোদ্দা কথা উনি ছিলেন একজন সাদামাটা ধরনের কর্মঠ মানুষ।

পণ্ডিত মিয়াভাইর একটা সাইকেল ছিল, ঐ সাইকেলে চড়ে উনি ঘুরে বেড়াতেন। উকিল খালুজানের আরো কয়েকটা ছেলে মেয়ে ছিল। পণ্ডিত মিয়াভাই ছিলেন তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। বড়ভাই মহকুমার কালেক্টরি আপিসে চাকুরী করতেন, তাই তিনি ছিলেন অফিসার। পণ্ডিত মিয়াভাই দ্বিতীয়। ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার; উচ্চ শিক্ষিত ঢাকায় বড় চাকুরী করতেন, গুলশানে তার বাড়ী। আমাদের পাড়ার সবারই প্রায় একান্নবর্তী পরিবার। ওনাদের তাই। পণ্ডিত মিয়াভাই লেখাপড়ায় কম বাবা মা তাই ছেলেকে অল্প বয়েসে বিয়ে করিয়ে ঘরে বউ তুলে এনেছিলেন।ওনার বউ হেঁসেলে কাজ করতেন আর উনি ময়দানে।

পণ্ডিত মিয়াভাই আমার মাকে খালাজি বলে ডাকতেন। মাঝে মাঝে আমার মায়ের কাছে এসে তাঁর দুঃখের কথা শেয়ার করতেন। বলতেন বড়ভাই অফিসার হওয়ায় সংসারে তাঁর উপর কিভাবে অবিচার করা হচ্ছে। আমার মা পাড়ার অন্য ছেলেদের চেয়ে পণ্ডিত মিয়াভাইকে একটু বেশি খাতির করতেন। এর অন্য একটা কারণও ছিল। পণ্ডিত মিয়াভাইর ছোট বোন সুহু আপা ছিলেন আমাদের দুধ বোন। ঘটনাটা এরকম। আমার বড়বোন মম আপা আর পণ্ডিত মিয়াভাইয়ের ছোট বোন সুহু আপা'র জন্ম অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে। খালাম্মার আতুর ঘরে কি জানি এক কঠিন রোগ হয়েছিল; ডাক্তার খালাম্মাকে তার শিশু মেয়েকে বুকের দুধ পান করাতে বারণ করেছিলো। তাই আমার মা আমার বড় বোন আর সুহু আপাকে একসাথে তার বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে ছিলেন। সেই থেকে অন্যান্য উকিল মোক্তারদের চাইতে পণ্ডিত মিয়াভাইদের পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের একটা অন্য রকম সম্পর্ক ছিল। আমি এসব জেনেছি অনেক বড় হওয়ার পরে - মায়ের মুখে গল্প শুনে।

আমি ছিলাম আমার মায়ের অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে শেষের দিকের সন্তান। বড় দু'ভাই, তারপর চার চারটি বোন, তারপরে আমার জন্ম। একের পর এক চার চারটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে আমার মা'র বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো। আর তাই ছোটটা'পার জন্মের পর মা নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন -ওটাকে ফেলে দে। এই নিয়ে ছোটটা'পা বরাবর মাকে ক্ষেপাত- মা তুমি তো আমাকে ফেলে দিতে চেয়েছিলে। চার কন্যা সন্তানের জন্মের পরে আমি ছেলে হয়ে জন্মালাম। মা আমাকে পেলেন- না যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমার বড় বোনরাও আমাকে অনেক আদরে সাদরে বড় করেছেন। মনে পড়লে হাসি পায়; ছোটবেলায় আমি মশারীর নীচে শুলে ঘুম আসতো না। মশারীকে ভয় পেতাম; আপারা জেগে থাকতেন, আমি কখন ঘুমাবো, আমি ঘুমালে তারপর মশারী টাঙ্গাতেন।

ছোটবেলায় আমাদের ভাইবোনদের সবার মায়ের দেয়া কিছু রুটিন মেনে চলতে হতো। এই রুটিনের হের ফের হলে মা খুব ক্ষেপে যেতেন। যেমন দুপুরের খাবারের পরে একটু নিদ্রা যাওয়া। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে পরিপাটি হয়ে তারপর খেলতে যাওয়া। মনে পড়ে কতদিন চোখে ঘুম আসে না, অথচ চোখ বন্ধ করে ভর দুপুরে ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিলাম।

এমনই এক গ্রীষ্মের দিনে আমার এক ফুফাতো ভাই আসলেন আমাদের বাসায়। কিসের ঘুম আর কিসের মায়ের বকুনি। দুপুরের খাবারের পরে আমি চুপিসারে আমার সেই ভাইয়ের সাথে বাড়ির বাইরে বেড়াতে গেলাম। আমার ভাই আমাকে নিয়ে হাটতে হাটতে বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে

গেলেন। পথে দু'আনার কাঠি-লজেন্স কিনে দিলেন। আমি তো মুক্তির মহানন্দে তার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় এসে দেখি, লোকজন নূতন টিউব ওয়েল বসাচ্ছে। তিনটি লম্বা লোহার মোটা পাইপ একসাথে চুড়ায় বাঁধা। অনেক উঁচুতে একলোক সরু একটি পাইপ নিচের দিকে নিশানা করে ধরে রেখেছে, আর নীচে পাঁচ ছয়জন লোক মিলে লোহার শিকল পেঁচিয়ে তেলের ঘানির মত করে ঘুরছে, আর মুখে গানের সুরে সুর তুলে নেচে নেচে টিউব ওয়েলের লোহার পাইপ মাটিতে গাড়ছে। বেশ অবাক করার মত দৃশ্য। আমি আমার জীবনের প্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতার পুরোটাই সেদিন উপভোগ করার মহানন্দে উন্মত্ত। বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই গিয়েছি। কোনদিক দিয়ে যে সময় পাড় হয়ে গেছে টেরও পাইনি। এদিকে বেলা দুপুর গড়িয়ে পড়ন্ত বিকেল, সূর্য অস্ত যাবার আর বেশী বাকী নেই, সে দিকে আমার কোন খেয়ালই নেই।

হঠাৎ দেখি পণ্ডিত মিয়াভাই সাইকেলে সম্পূর্ণ ভিজা কাপড়ে। আমাকে দেখেই রাগের স্বরে বললেন "বদমাইশ তুই এখানে আর আমরা তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান"- বলেই তিনি চিলের মত ছোবল মেরে একটানে আমাকে সাইকেলে। ফুল স্পীডে সাইকেলে প্যাডেল মেড়ে ছুটলেন বাড়ীর দিকে। আমাদের বাসার কাছাকাছি আসতেই উনি চিৎকার শুরু করে দিলেন; পেয়েছি, পেয়েছি, খালাজি ওকে পেয়েছি। আমি তো হতবাক, দেখি পুড়ো পাড়াসুধ্ব এক হুলুস্থুল কাণ্ড। আমার বাবা মা আর বোনদের সবার কাপড় চোপড় ভিজা, সাথে পাড়ার আরও কারও কারও। আমার মা বোনরা অঝোরে কাঁদছে। বাড়ীর মধ্যে বহু মানুষ। মা আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না, সেই সাথে সাথে আপারাও কাঁদছে।

দুপুর থেকে আমি নিখোঁজ, বিকেলের খেলার সাথীদের সাথেও আমি নেই, সাথীরাও কেউ আমকে কোথায়ও দেখেনি। অনেক খোজা খুঁজি করে আমাকে না পেয়ে সবাই ধরেই নিয়ে ছিলো যে আমি হয়ত পুকুরের পানিতে ডুবে আছি। আমি তখন অনেক ছোট- সাঁতারও জানি না। সুতরাং পাড়ার লোকজন মহল্লার প্রায় প্রত্যেকটি পুকুর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে আমাকে পানিতে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এই অল্প বিদ্বান পণ্ডিত মিয়াভাই সেদিন ভিন্ন ধারায় চিন্তা করে আমাকে খুঁজে বের করে আমাকে আমার মায়ের বুকে ফিরেয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কি জানেন, সেই পণ্ডিত মিয়াভাইয়ের একটি ছেলে আমার এ পানি ডুবির ঘটনার বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন পানিতে ডুবে মারা গেলো। ছেলেটির নাম ছিল শিশু, ওর বয়স তখন বার কি তের বছর হবে হয়ত। শিশু মৃগীরোগে (এপিলেপ্সি) ভুগছিল; সবাই ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতো। কিন্তু একদিন বিধিবাম, সবার অলক্ষ্যে মৃগী রোগের খিঁচুনি উঠে (এপিলেপ্টিক সিজারে) শিশু পুকুরের পানিতে পড়ে যায়; পানি থেকে আর উঠে আসতে পারেনি। অনেক খোঁজা খুঁজির পর পুকুরের পানিতে ওর লাশ পাওয়া গেল। ওর দেহ পুকুর থেকে তুলে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনা যায়। তারপর প্রায় একদিন লেপ দিয়ে ওর দেহ ঢেকে রাখা হয়েছিল- কি জানি দেহে প্রাণ ফিরে আসলে আসতেও পারে। কিন্তু না তা আর হল না। অবশেষে পাড়ার সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে শিশু চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেল।